# মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের সাম্প্রতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে

রাখাল রাহা

মাদ্রাসা শিক্ষায় আমাদের লক্ষ লক্ষ সন্তান লেখাপড়া করছে, ওদের শিক্ষার সাথে জড়িয়ে আছে আমাদের লাখো শিক্ষক। কিন্তু এর কারিকুলাম, পাঠ্যক্রম, শিক্ষাদান-পদ্ধতি, মূল্যায়ন-পদ্ধতি, স্তর ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের জানাশোনা অনেক কম। মাদ্রাসার শিক্ষকদের সাম্প্রতিক একটি আন্দোলন-বিশ্লেষণের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার এ দিকটার প্রকট বৈষম্যের প্রতি একটু আলো ফেলাই এই লেখার উদ্দেশ্য। এতে ব্যবহৃত তথ্যগুলোর অধিকাংশই আন্দোলনরত শিক্ষকদের থেকে সরাসরি প্রাপ্ত এবং বাকীগুলো সমসাময়িক নানা প্রতিবেদন থেকে গৃহীত।

প্রথমে মাদ্রাসা শিক্ষার ধারা সম্পর্কে বলা প্রয়োজন। সাধারণভাবে এদেশের মাদ্রাসা শিক্ষার দুইটি ধারা – আলিয়া ও কওমী, এমনটাই বলা যায়। কিন্তু এর মধ্যে রয়েছে অনেক উপধারা এবং বহু ধরনের ব্যবস্থাপনাগত কাঠামো। আলিয়া ধারা সরকারের মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন। আলিয়ার প্রাথমিক স্তরটা এবতেদায়ী। এর ঊর্ধ্বস্তর বিন্যস্ত হচ্ছে দাখিল (এসএসসি পর্যায়), আলিম (এইচএসসি পর্যায়), ফাজিল (স্নাতক পর্যায়), কামিল (স্নাতকোত্তর পর্যায়) এভাবে। যেমনভাবে সাধারণ শিক্ষায় কিছু হাইস্কুলের সাথে প্রাইমারী শিক্ষা সংযুক্ত আছে তেমনিভাবে দাখিল মাদ্রাসার সাথেও এবতেদায়ী শিক্ষা সংযুক্ত আছে। আর পৃথক প্রাইমারী স্কুলের মতো করে যে এবতেদায়ী মাদ্রাসা, সেগুলোকে বলা হয় স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা। প্রাইমারী স্কুলগুলো স্থানীয় মানুষ যেমন জমিজমা-টাকাপয়সা-শ্রম ইত্যাদি দিয়ে প্রতিষ্ঠার পর সরকারের নিবন্ধনের জন্য তদবীর করে কাঠখড় পুড়িয়ে নিবন্ধন পায়, তেমনি এই স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলোও।

আলিয়ার বাইরে যা রয়েছে সবাই এটাকে কওমী ধারার মাদ্রাসা বলে ধরে নেয়। এ ধরনের মাদ্রাসা প্রথম ভারতের দেওবন্দে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দেওবন্দকে সবাই অনুসরণ করে বলে অনেকে এটাকে দেওবন্দী ধারার মাদ্রাসাও বলে থাকেন। আলিয়া ধারার সকল এবতেদায়ী মাদ্রাসার জন্য নিবন্ধন বা দাখিল-কামিল মাদ্রাসার জন্য এমপিওভুক্তির বিষয় রয়েছে। কিন্তু কওমী ধারার মাদ্রাসায় এই নিবন্ধন বা এমপিওভুক্তির বিষয় নেই। তাই এগুলোর উপর সরকারের এখনো পর্যন্ত তেমন কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। সম্প্রতি এর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নানা বাদবিবাদ আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই ধারার মাদ্রাসা সম্পর্কে যেহেতু তথ্য সবচেয়ে কম জানা যায় সে-কারণে এর বিষয়ে বিভ্রান্তিও সবচেয়ে বেশী। আলিয়ার মতো কওমী মাদ্রাসাও নানা দান-অনুদানে প্রতিষ্ঠা হলেও আলিয়ার সাথে এর পার্থক্য হলো, এর পুরো কার্যক্রমই বলতে গেলে দান-অনুদানে চলে। তারা এই শিক্ষার সরকারী স্বীকৃতি দাবী করলেও সরকারের কোনো ধরনের হস্তক্ষেপের বিরোধী। এর নিয়ন্ত্রণের জন্য আছে তাদেরই ১৯টি কর্তৃপক্ষ, মতান্তরে ৩৫টি। এদের মধ্যে একটি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ আছে বেফাকুল মাদারাসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ (বেফাক) নামে। তবে এই কেন্দ্র অর্থ এটা নয় যে সকল কওমী মাদ্রাসা বেফাকের অধীভুক্ত। এদের বিভিন্ন জেলা ভিত্তিক কর্তৃপক্ষ বা বোর্ড রয়েছে, যারা স্থানীয় কওমী মাদ্রাসাগুলোর কর্তৃপক্ষ হিসাবে কাজ করছে। স্বাভাবিকভাবেই এসব কর্তৃপক্ষের মাঝে আছে নানা ধরণের মতপার্থক্য ও দ্বন্দ্ব।

আলিয়ার মতো কওমী মাদ্রাসাও নানা দান-অনুদানে প্রতিষ্ঠা হলেও আলিয়ার সাথে এর পার্থক্য হলো, এর পুরো কার্যক্রমই বলতে গেলে দান-অনুদানে চলে। তারা এই শিক্ষার সরকারী স্বীকৃতি দাবী করলেও সরকারের কোনো ধরনের হস্তক্ষেপের বিরোধী। এর নিয়ন্ত্রণের জন্য আছে তাদেরই ১৯টি কর্তৃপক্ষ, মতান্তরে ৩৫টি। এদের মধ্যে একটি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ আছে বেফাকুল মাদারাসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ (বেফাক) নামে।

২.

সম্প্রতি আলিয়া ধারার স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকগণ দীর্ঘদিনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে নানা আন্দোলন-সংগ্রামের এক পর্যায়ে ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থান ধর্মঘট করেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে অনশন কর্মসূচীতে যান। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার নানা স্তরের মধ্যে বৈষম্য রয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে বৈষম্যের চিত্রটা কেমন তা বোঝার জন্য আশির দশক থেকে সরকার ও তার প্রশাসন মিলে যেসব ফাইল চালাচালি করেছে, হিসেব-নিকেশ-বরাদ্দ ইত্যাদি নিয়ে কথা ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সেগুলোর একটা কালপঞ্জী করা যেতে পারে। নানা সময়ে আমাদের সরকারের গৃহীত এইসব সিদ্ধান্তগুলোর ধরন শিক্ষা বিষয়ে রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৭৮ : মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার জন্য অর্ডিন্যান্স জারি।

১৯৮৪ : অর্ডিন্যান্সের ২ ধারা অনুযায়ী স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলোকে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধন প্রদান।

১৯৮৬ (১৩.০২) : শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে প্রাইমারী স্কুল ও স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসাকে সমমান নির্ধারণ।

১৯৯৪ (০৮.০৫) : নিবন্ধিত প্রাইমারী স্কুল ও স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকদের বেতনভাতা ৫০০ টাকা নির্ধারণ।

১৯৯৬ (১০.০১) : মাদ্রাসা প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা – সকল নিবন্ধিত এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকগণ নিবন্ধিত প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকদের সমপরিমাণ বেতন-ভাতা পাবেন (অর্থাৎ ৫০০ টাকা)।

১৯৯৭ (২৬.০২) : শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকদের বেতন বাবদ অনুদান মঞ্জুরীর নীতিমালা প্রণয়ন।

২০০২ : সরকার কর্তৃক মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার কমিটি গঠন। সকল নিবন্ধিত এবতেদায়ী মাদ্রাসাকে নিবন্ধিত প্রাইমারী স্কুলের সমান বেতন প্রদান ও পর্যায়ক্রমে জাতীয়করণের সুপারিশ।

২০০৮ (১৭.১১) : শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত – নিবন্ধিত ৬৮৮২টি এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকেরা নিবন্ধিত প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকদের

ন্যায় ৩০০০ টাকা নয়, কমিউনিটি প্রাইমারী স্কুলের সমান ১৪৪০ টাকা বেতন-ভাতার সুপারিশ।

২০০৯ (২৫.০২) : প্রধানমন্ত্রীর সংসদ বক্তৃতায় ঘোষণা – নিবন্ধিত প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকদের ন্যায় নিবন্ধিত এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকেরা জাতীয় স্কেলে বেতন-ভাতা পাবেন।

২০০৯ : স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকদের বেতনভাতার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ ও তা প্রাপ্তির উৎস সন্ধানের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ।

২০০৯ (১৩.০৯) : মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের জবাব – ১৫১৯টি মাদ্রাসার ৬০৭৬ জন শিক্ষকের জন্য ২১ কোটি ৬১ লক্ষ টাকার মতো লাগবে (মাসিক ৩৫৭০ টাকা, যেটা নিবন্ধিত প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকেরা তখন পেতেন) এবং এর জন্য অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব।

২০১০ (০৫.০৫) : শিক্ষামন্ত্রীর আশ্বাস – নিবন্ধিত প্রাইমারী স্কুলের মতো নিবন্ধিত এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকদের জাতীয় স্কেলে বেতন দেওয়া হবে।

২০১১ (০৩.০৭) : প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার তালিকা প্রস্তুত করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ (তখনও পর্যন্ত ৫০০ টাকা করে ভাতা প্রাপ্ত ১৫১৯টি এবং ভাতাবিহীন ৫৩২৯টি)।

২০১১(১৪.০৯) : প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাজেট বিভাগকে ৫৩২৯টি স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার ২৫৩৩৫ জন শিক্ষকের বেতনভাতা মাসিক ১ হাজার টাকা নির্ধারণ করে ৩০ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার সংস্থানের জন্য জন্য নির্দেশ। (আগে থেকে যে ১৫১৯টি মাদ্রাসা ১৯৯৪ সাল থেকে ৫০০ টাকা ভাতা পেয়ে আসছিল সেটা বেড়ে তখন ১ হাজার টাকা হয়েছিল।)

> এমন সংকট সৃষ্টি হওয়ার কথা ছিল না যদি আমাদের সরকারগুলো তার ঘোষিত সর্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইন (যেটা ১৯৯০ সালে পাশ করেছে) এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম (যেটা ১৯৮৮ সালে প্রণয়ন করেছে) এটাকে সত্যিকার অর্থে গুরত্ব দিতো।

২০১০–১৩ : প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও শিক্ষামন্ত্রীর কার্যালয়ে স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির আবেদন ও বৈঠক, সাংবাদিক সম্মেলন, মিটিং, মিছিল, মানববন্ধন ইত্যাদি কর্মসূচী পালন।

২০১৩ (০৯.০১) : ২২-২৩ হাজার নিবন্ধিত প্রাইমারী স্কুল জাতীয়করণ এবং শিক্ষকদের বেতন ২২-২৩ হাজার টাকায় উন্নীতকরণ।

২০১৪ (০৯.১২) : জাতীয় প্রেসক্লাবে শিক্ষক সমাবেশ। প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রীর ঘোষণা – স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা জাতীয়করণের দাবী যৌক্তিক, শিক্ষামন্ত্রীর সাথে আলোচনা করে বাস্তবায়ন করা হবে। খাদ্যমন্ত্রীর ঘোষণা – নিবন্ধিত প্রাইমারী স্কুলের মতো নিবন্ধিত এবতেদায়ী মাদ্রাসাকেও পর্যায়ক্রমে জাতীয়করণ করা হবে।

২০১৫ (১০.০৬) : ঢাকায় শিক্ষক সমাবেশ। ডেপুটি স্পীকারের বক্তব্য – দাবী যৌক্তিক এবং প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের সাথে আলোচনা করে বাস্তবায়ন করা হবে।

২০১৬ (০৩.০১) : সকল জেলায় স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির সমাবেশ ও শিক্ষামন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান।

২০১৬ (১০.০২) : জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির সমাবেশ ও প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান।

২০১৬ (১৫.০৩) : স্মারকলিপির ভিত্তিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রদান।

২০১৬ : প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রদান।

২০১৬ (২১.০৮) : স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির শিক্ষকদের সাথে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী এবং সচিবের বৈঠক।

২০১৬ (২৭.০৯) : সমস্যা নিরসনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী কর্তৃক একজন অতিরিক্ত সচিবকে আহ্বায়ক করে ৬ সদস্যের ওয়ার্কিং কমিটি গঠন।

২০১৭ (০৪.০৫) : ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং।

২০১৭ (২৫.০৫) : ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যানের নিকট স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসা ও এর শিক্ষক সংখ্যা জানাতে পত্র প্রদান।

২০১৭ (১৪.০৬) : এবতেদায়ী মাদ্রাসার কার্যক্রম প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ হতে পরিচালনার সিদ্ধান্ত। কারিগরী ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা ও এর শিক্ষক সংখ্যার তালিকা হস্তান্তর।

২০১৭ (২৯.০৮) : স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির সাথে কারিগরী ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিবের বৈঠক। সমিতির ৮ দফা দাবী পেশ।

২০১৭ (০৭.১১) : এ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন বিষয়ে কারিগরী ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগে সভা।

২০১৭ (২৬.১২) : এ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন বিষয়ে কারিগরী ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের চূড়ান্ত সভা। সমিতির পক্ষ থেকে ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা জাতীয়করণের দাবী মানার আহ্বান জানানো হয়। না মানলে ১লা জানুয়ারী ২০১৮ থেকে ঢাকায় অবস্থান ও অনশনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত ঘোষণা।

২০১৮: ১লা জানুয়ারী থেকে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থান এবং ৯ তারিখ থেকে অনশন শুরু।

খেয়াল করি দীর্ঘ কালপঞ্জীটা। কত কত দপ্তর আর কত কত সিদ্ধান্ত! আর কি ফলাফল! এর বাইরে আরো বহু তারিখ রয়েছে বিষয়টার সাথে সংশ্লিষ্ট, যেগুলো এখানে বাদ দেওয়া হয়েছে। এতকিছুর পরও এখন পর্যন্ত ১৫১৯টি স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকগণ সর্বোচ্চ ২৫০০ টাকা করে বেতন-ভাতা পাচ্ছেন। আর সরকারের হিসাবে নিবন্ধিত ও জাতীয়করণের প্রতিশ্রুতিপ্রাপ্ত বাকী ৫৪৭৯টি স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকেরা বিনা বেতন-ভাতায় বছরের পর বছর কাজ করছেন।

**৩.**

আমাদের কত শিশু স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসায় পড়ছে? এবার যে প্রায় ৩০ লক্ষ ছেলেমেয়ে প্রাথমিক সমাপনী নামক পরীক্ষা-তামাশায় বসেছিল জানা যাচ্ছে তার মধ্যে এবতেদায়ী মাদ্রাসার (কওমী ধারার

নয়) শিক্ষার্থী ছিল প্রায় ৩ লক্ষ। এই এবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলো সরকারের প্রণীত পাঠ্যবই-ই পড়িয়ে থাকে এবং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর মতোই পাঠদান ও পরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে। একই সাথে সরকারের হুকুমে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা যেসব শিক্ষা-বহির্ভূত কাজকাম করেন এই মাদ্রাসার শিক্ষকেরাও তা করেন।

জানা যাচ্ছে সরকারের শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ও মাদ্রাসা বোর্ডের হিসাবে নিবন্ধন পাওয়া ৬৯৯৮টি স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার বাইরেও এমপিওভুক্ত দাখিল মাদ্রাসার সাথে সংযুক্ত এবতেদায়ী মাদ্রাসার সংখ্যা প্রায় ৯ হাজার। এ ছাড়াও নিবন্ধন না-পাওয়া এবতেদায়ী মাদ্রাসা রয়েছে কয়েক হাজার। সুতরাং আনুমানিক একটা হিসাব করে বলা যায় যে, প্রাথমিক স্তরের এবতেদায়ী মাদ্রাসায় মোট আমাদের প্রায় ২৫ লক্ষের অধিক ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করে।

কালপঞ্জী থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ১৯৯৪ সালে সরকার যে পরিপত্রে ৫০০ টাকা করে নিবন্ধিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনভাতা নির্ধারণ করেছিল সেই পরিপত্রেই এ সকল এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকদেরও বেতনভাতা ৫০০ টাকা করে নির্ধারণ করা হয়। এরপর এ ধরণের স্কুল ও মাদ্রাসার নিবন্ধন বেড়ে চলে এবং সরকারও শিক্ষকদের বেতনভাতা ৫০০ টাকা থেকে বাড়াতে বাড়াতে ২০১২ সালের দিকে (মাত্র) ২৫০০ টাকায় উন্নীত করে। এরপর ২০১৩ সালে প্রায় ২২-২৩ হাজার নিবন্ধিত প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হলে সেই শিক্ষকদের বেতন প্রায় ২২-২৩ হাজার টাকায় পৌঁছে যায়। কিন্তু স্বতন্ত্র যে মাত্র ১৫১৯টি এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষক ভাতা পাচ্ছিলেন তারা এখন পর্যন্ত সেই ২৫০০ টাকাতেই আছেন।

এমন সংকট সৃষ্টি হওয়ার কথা ছিল না যদি আমাদের সরকারগুলো তার ঘোষিত সর্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইন (যেটা ১৯৯০ সালে পাশ করেছে) এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম (যেটা ১৯৮৮ সালে প্রণয়ন করেছে) এটাকে সত্যিকার অর্থে গুরত্ব দিতো এবং এগুলো বাস্তবায়নের জন্য সঠিক পরিকল্পনা ও প্রয়োজনীয় বরাদ্দ নিশ্চিত করতো। কিন্তু আমাদের সরকারগুলো এটা না করে তাদের স্বার্থে শিক্ষায় বিভাজনের পথ আরো প্রশস্ত করেছে। যেহেতু সরকার ঘোষিত বাধ্যতামূলক ও সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা এই এবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলোও বাস্তবায়ন করছে, তাহলে তাদের জাতীয়করণ করা হবে না কেন, এমন প্রশ্ন খুবই যৌক্তিক। এভাবে সমস্যা যখন চক্রাকারে সবাইকে জড়িয়ে ফেলছে তখন আমরা এ-ওকে দোষ দিয়ে রেহাই পেতে চাচ্ছি।

**৪.**

উল্লিখিত কালপঞ্জী থেকে আরো স্পষ্ট যে, লেজে গোবর মাখিয়ে এরপর লেজ নেড়ে কার্যসাধন করা হচ্ছে আমাদের শাসন-প্রশাসনের কাজের ধরন। সুতরাং যা হয় – আমরা তাদের লেজ নাড়তে দেখি, নাড়ার শব্দ শুনি – আর আমাদের সর্বনাশ যা হওয়ার হতে থাকে। কেননা ১৯৯০ সালের পর থেকে এই রাষ্ট্রের সকল শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব আইনত সরকারের থাকলেও এটা ছিল আসলে কাজীর গরু! তাই কত শিশু তখন শিক্ষার বাইরে, তাদের স্কুলে আনতে কি করতে হবে, কি কি সামাজিক-অর্থনৈতিক নিরাপত্তা তাদের পরিবারের লাগবে, কতগুলো স্কুল বা কতজন শিক্ষক লাগবে, এর জন্য কত বরাদ্দের প্রয়োজন, বরাদ্দের সংকট কিভাবে মেটানো হবে – এসব বিষয়ের মধ্যে কোনো সমন্বয় আমরা দেখতে পাইনি গত প্রায় তিরিশ বছর ধরে।

এই যে ক'দিন আগে বারো-চৌদ্দোশো মাদ্রাসা উন্নয়নের জন্য সংসদ সদস্যদের হাতে নগদ প্রায় সাড়ে ৭ হাজার কোটি টাকা ধরিয়ে দেওয়ার প্রকল্প তৈরী করার কথা জানা গেল, এগুলো দিয়ে কি করা হবে? – ছয় তলা করে বিল্ডিং তৈরী করে দেওয়া হবে। অথচ জানা যাচ্ছে এই স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকদের দাবীর সর্বনিম্নটুকু মেনে নেওয়ার জন্য সরকার ভাবছে তাদের ৯ হাজার টাকার মতো মাসিক বেতন-ভাতা নির্ধারণ করবে। এতে ৬৯৯৮টি মাদ্রাসার প্রায় ২৫ হাজার শিক্ষকের জন্য মাসে কত টাকা ব্যয় হবে? বছরে কত টাকা ব্যয় হবে? পাটিগণিতের হিসাব করলে দেখা যাবে এমপিদের ভোটের খরচ নির্বাহ আর পকেট ভারী করার জন্য তৈরী করা এই প্রকল্পের সাড়ে ৭ হাজার কোটি টাকা দিয়ে স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকদের প্রায় ৩০ বছর ধরে বেতনভাতা দেওয়া যায়। কোনটা শিক্ষার উন্নয়নের জন্য জরুরী? কিন্তু এই প্রশ্ন শাসক-প্রশাসক শুনবে না।

**৫.**

মাদ্রাসা শিক্ষার কারিকুলাম, পাঠ্যবই, পরীক্ষাপদ্ধতি, মূল্যায়নব্যবস্থা কওমী ধারার ক্ষেত্রে অনেকটাই স্থির। আর আলিয়া ধারা এখন সাধারণ শিক্ষার মতোই কম-বেশী সরকারের পরীক্ষা-নিরীক্ষার শিকার। এর সবকিছু এখন সাধারণ ধারার অনেকখানিই কাছাকাছি। কিন্তু কওমী ধারা তা নয়। সাধারণ শিক্ষাধারা থেকে এর ব্যবধান অনেক বেশী। সে-কারণে সাধারণ ও কওমী, এই দুই শিক্ষা ধারা থেকে বের হওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানা বিষয়ে একটা দৃশ্যমান পার্থক্য খুব সহজেই চোখে পড়ে। যেটা বলা হয়, একটা জাতিরাষ্ট্র গঠনের জন্য, জাতির অগ্রগতির জন্য এর শিক্ষাপদ্ধতি এমন হতে হয় যাতে সমাজের নানা পর্যায়ের মানুষের চিন্তাচেতনার বৈপরীত্যের জায়গাগুলো কমে আসে। কিন্তু আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এই বৈপরীত্য ও ব্যবধান বাড়িয়ে তুলছে ক্রমশ। শাসকশ্রেণী এমনটাই চাইছে। যদি প্রকত অর্থেই এই ব্যবধান কমাতে হয়, তবে আলিয়া ও কওমী মাদ্রাসা মিলিয়ে আমাদের যে ৫০ লক্ষ শিক্ষার্থী সেখানে পড়ছে, তাদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা আগে বুঝতে হবে। মানতে হবে এই রাষ্ট্রের ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকল শিশুর সুস্থভাবে বিকাশ এবং শিক্ষালাভের যে অধিকার রয়েছে তা বৈষম্যহীনভাবে প্রদানের দায়িত্ব রাষ্ট্রের। তাই সকল ধরণের বৈষম্যভাবনা ত্যাগ করে তার শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচী, পাঠ্যবই, শিক্ষাদান পদ্ধতি, পরীক্ষা পদ্ধতি, মূল্যায়ন ব্যবস্থা ইত্যাদি যুগোপযোগী করার বিষয়ে ভাবতে হবে।

কিন্তু এটা না করে যেসব আয়োজন করা হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলোর পরোক্ষ উদ্দেশ্য থাকে সরকারের প্রশাসনিক পরিধির বাইরে থাকা এসব শিক্ষা ও শিশুকে তার হিসাব-কিতাবের মহাজনী খাতার মধ্যে ছলে-বলে এনে তার শিক্ষাবাণিজ্যের সীমানাকে আরো বাড়িয়ে তোলা। প্রকৃতপক্ষে এদেশের সব শিশুই আমার শিশু, এদেশের সকল মানুষই আমার মানুষ, দেশের উন্নয়ন মানে দেশের মানুষের উন্নয়ন – সত্যিকারের এমন বোধ নিয়ে এগিয়ে গেলেই কেবল সম্ভব মাদ্রাসা শিক্ষাসহ সকল শিক্ষাসংকটের সমাধান।

***রাখাল রাহা:*** আহ্বায়ক, শিক্ষা ও শিশু রক্ষা আন্দোলন (শিশির)।
***ইমেইল:*** sompadona@gmail.com